



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 326 - 334

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

‘অন্তর্জলী যাত্রা’র কমলকুমার মজুমদারের গদ্যশৈলী

হিমাদ্রি শেখর চক্রবর্তী

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ধিং কলেজ, নগাঁও, আসাম

Email ID : chakrabortyhimshekhhar@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Kamalkumar,
Bengali Literature,
Antarjali Yatra,
Novel, Prose, Style,
Word, Sentence.

Abstract

Kamalkumar Majumdar (1914-1979) is almost unanimously known as well as famed as one of the most unintelligible writers in the vast and varied mosaic of Bengali literatures. From his first novel, ‘Antarjali Yatra’, Kamalkumar adopted an almost unprecedented style of story-telling to which the average Bengali readers were not accustomed yet. This strangeness and unintelligibility went on to the extent of making the readers, at least the ones who were ready for something else in a more docile way of presentation, avoid him altogether, though he got a small group of readers who were fascinated with his works.

Kamalkumar Majumdar started novel writing at a relatively later part of his career. Actually he did his spadework quite thoroughly by educating and readying himself for the field he was going to explore. His education, though, was not confined to the conventional framework of any academic curriculum. Kamalkumar Majumdar was into painting without any formal knowledge from any specific school of art. He was an extensive reader and almost gobbled whatever was written in Bengali in his time. Besides, he learnt the French language well enough to enrich and enlighten his mental fabric.

Before Independence, during the World War II, he made money through maritime export-import, pisciculture and spent a life of luxury which was in sharp contrast to the life of penury he led and accepted nonchalantly in the post-Independence time. He had no source of permanent or stable income at that time which led him to take up a variety of temporary jobs associated with arts and craft. This was followed by a somewhat settled and secured job of a teacher of arts and craft in South Point School. In the meanwhile, he got an opportunity to come on contact with and study the rural life and culture of Bengal from close quarters owing to his involvement in the census of Bengal on a reference from ICS Ashok Mitra.

Where Kamalkumar started writing his masterpiece ‘Antarjali Yatra’, he had already accumulated and enriched himself with a host of versatile knowledge of art, music, folk art and culture, French, English and Sanskrit literature, sculpture etc. Thus, ‘Antarjali Yatra’ is a reflection as well as an outcome of his versatile character, his multidimensional personality and

genius. In the article in question, we shall try to delve into the enigma of his words, the intricacies of his sentences that were liberated from the chains, from the bondage of meaning what they were supposed to mean, until then!

Discussion

বাংলা গদ্যের এ পর্যন্ত ইতিহাসের একটি স্কেচ টানতে হলে আমাদের ঊনবিংশ শতক থেকেই শুরু করতে হবে। কেরি, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, বিদ্যাসাগর হয়ে বাংলা গদ্যের ক্রমবিবর্তন সার্থকতা লাভ করল বঙ্কিমের হাতে। আর ‘সব পথ এসে মিলে গেল শেষে’ রবীন্দ্রনাথের রচনায়। উপন্যাস বলতে যেহেতু আমরা গদ্য মাধ্যমে বিবৃত এবং বিধৃত এক শিল্পরূপ বুঝি তাই এই মাধ্যমটির প্রয়োগরীতির হেরফের উপন্যাস রসের হেরফের ঘটায় কিনা – রবীন্দ্রোত্তর যুগের উপন্যাসে তা অবশ্যই বিচার্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে সমস্ত অনুভূতিই এই গদ্যে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত গদ্যে প্রকাশ করা যাবে বলে যখন বাঙালি নিশ্চিত হয়ে বসেছিল তখনই ১৯৫৯ সালে ‘নহবৎ’ নামে একটি স্বল্প-পরিচিত পত্রিকায় ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। লেখক কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯)। এটিই তাঁর প্রথম উপন্যাস। হিরণ্য গঙ্গোপাধ্যায় বলেন,-

“উপন্যাসটি প্রকাশের পর পরই কমলকুমার হয়ে উঠেছিলেন নিন্দা-প্রশংসার কেন্দ্রবিন্দু। ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ - পূর্ব পাঠক এই শ্রেণীর রচনার সঙ্গে অরিচিত ছিলেন না, ফলে একশ্রেণীর পাঠক নিজের অপ্রস্তুতি মেনে নিতে পারেন নি, তাঁরা কমলকুমারকে ষোলোআনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। উলটো দিকে উপন্যাস শৈলীর এমন প্রস্তুতি, শান ও ব্যবহারে আর উপন্যাস কল্পনার এমন মৌলিকতার সামনে কোনো আত্মরক্ষার আড়ালও যাঁরা জোগাড় করে উঠতে পারেন নি, তাঁরা সেদিনই কমলকুমারকে ষোলো আনার উপর আঠারো আনা মেনে নিয়েছিলেন।”^১

কমলকুমার মোট আটটি উপন্যাস লিখেছেন। এছাড়া রয়েছে অনেকগুলি ছোটগল্প। আনন্দ পাবলিশারস্ থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘উপন্যাস সমগ্র’ (১ম সং, ২০০২) ভিতরের মলাটে তাঁর পরিচয়ে বলা হয়েছে -

“কাজ করেছেন নানা জায়গায়। বাংলা সরকারের জনগণনা বিভাগে, গ্রামীণ শিল্পে ও কারু শিল্পে, ললিতকলা একাদেমিতে এবং সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ... বহুবিচিত্র বিষয়ে ছিল তাঁর সাবলীল বিচরণ। ছবি, নাটক, কাঠের কাজ, ছোটদের আঁকা শেখানো, ব্যালে নৃত্যের পরিকল্পনা, চিত্রনাট্য রচনা - কী করেননি ... বাংলার টেরাকোটা, রামায়ণ ইন ফোক আর্ট বা বাংলার সাধকের মতো ডকুমেন্টারি চিত্রনাট্যও তাঁরই তৈরি।”^২

‘অন্তর্জলী যাত্রা’ যেমন প্রকাশিত হয়েছিল একটি অনামী লিটল ম্যাগাজিনে, তেমনই তাঁর অন্যান্য প্রায় সব গল্প উপন্যাসই প্রকাশিত হয়েছিল এক্ষণ, কৃতিবাসের মতো ছোট পত্রিকায়। শুধু ‘মতিলাল পাদরি’ এবং ‘তাহদের কথা’ প্রকাশিত হয়েছিল ‘দেশ’ পত্রিকায়। তাঁর পাঠক সংখ্যাও অঙ্গুলিমেষ। শুধুমাত্র ছোট পত্রিকায় লিখতেন বলেই যে তাঁর পাঠক সংখ্যা কম ছিল, তা নয়, প্রকৃতপক্ষে হিরণ্য কথিত তাঁর লেখার রসগ্রাহিতার অপ্রস্তুতিই মুখ্য কারণ। ‘উপন্যাস সমগ্র’র ভূমিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এ খবর আমাদের জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন -

“পুস্তকাকারে প্রকাশের পর ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ পাঠক মহলে কোনো সাড়া জাগায় নি। তাঁর খ্যাতি কিছু নবীন লেখকদের, বিশেষত কবিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমরা এই উপন্যাস পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলুম বলা যায়। এরকম কোনো রচনা আমরা বাংলা ভাষায় আগে পড়িনি।”^৩

‘এরকম কোনো রচনা আমরা বাংলা ভাষায় আগে পড়িনি।’ সুনীল গাঙ্গুলির এই স্বীকারোক্তির রেশ ধরে কমলকুমারের শৈলী আলোচনায় আমরা এগিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তারও আগে কমলকুমার মজুমদারের আরও একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যিক কেননা তাঁর নিজস্ব শৈলীর পশ্চাতে কী কী কারক কার্যকরী ছিল তা স্পষ্ট না হলে বিশ্লেষণটি যথার্থ হবে না। কমলকুমারের পিতা প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার পুলিশে চাকরি করতেন। মাতা রেণুকা মজুমদারের সাহিত্যের নেশা ছিল। মায়ের সাহিত্যপ্রীতি ছাড়াও বিভিন্ন ঘরোয়া শিল্পের প্রতিও আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট। মায়ের এই শিল্প সাহিত্যপ্রীতির

প্রভাব পড়ে তাঁর তিন সন্তানের ওপর – কমলকুমার, তাঁর ছোট ভাই নীরদ মজুমদার এবং বোন শানু মজুমদারের (লাহিড়ী) ওপর। শিল্পজগতে কমলকুমারের প্রতিভার কথা আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু এখানে দু'একটি ব্যাপারের ওপর আলোকপাত করতে চাই। কমলকুমার টোলে যথারীতি সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সেতার বাজানো শিখেছিলেন। ১৯৪৪-৪৫, এই দুবছর নিজে থেকে পেইন্টিং-এ উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁকে বিদেশে আহ্বান করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। দেশি বিদেশি বিভিন্ন আর্ট সম্বন্ধে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান। 'উষ্ণীষ' নামে একটি পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া গোয়েন্দা গল্পের একটি পত্রিকা 'তদন্ত' এবং শুধুই অঙ্ক নিয়ে একটি পত্রিকা 'অঙ্কভাবনা' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাঁরা কয়েকজন মিলে চলচ্চিত্রের ওপর একটি পত্রিকা 'চলচ্চিত্র' নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। এগুলির প্রত্যেকটিই স্বল্পায়ু। এসব পত্রিকায় কখনও স্বনামে আবার কখনও বেনামে কমলকুমারের অনেকগুলি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তিনি ফরাসি ভাষা উত্তম রূপে জানতেন এবং ফরাসি শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে ছিলেন পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মিলে একটি পত্রিকা বার করতে চেয়েছিলেন যেখানে শুধু ফরাসি রচনার অনুবাদ থাকবে। পরে অবশ্য সেটি আর সম্ভব হয়নি।

কমলকুমারের ভাই নীরদ মজুমদার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছাত্র ক্ষীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে 'Indian Society of Oriental Art - Calcutta'য় আঁকা শিখেছিলেন এবং Norman Blount Memorial Award-এর মতো পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ফরাসি সরকারের স্কলারশিপের টাকায় নীরদ প্যারিসে ভাস্কর্য (খোদাই) শেখেন। ১৯৫১-এ লণ্ডন আসেন, সেখান থেকে ১৯৫৫-এ আবার প্যারিসে চলে যান। দশ বছর তিনি ইউরোপে থেকে ১৯৬৭-তে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। ফেরার পর ধীরে ধীরে তাঁর ক্যানভাসে তান্ত্রিক থিম ঢুকতে আরম্ভ করে। অবনীন্দ্রনাথের যে স্বদেশ-বিদেশ মিশ্রিত ঘরানা, তা-ই যেন আরও স্পষ্ট হয়ে তাঁর অঙ্কনে ফুটে ওঠে। তাঁর আঁকার শেকড়ে ছিল বাংলার পরম্পরাগত শিল্প-কৌশল; যাতে তিনি মিশিয়েছেন ইউরোপীয় আধুনিকতা।^৪

বোন শানু মজুমদারও (লাহিড়ী) বিখ্যাত চিত্রকর এবং চিত্রশিক্ষিকা ছিলেন। তিনিও স্কলারশিপ পেয়ে প্যারিসে আঁকা শিখেছিলেন। ১৯৭০-এ তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসুয়াল আর্টের রিডার এবং পরে ওই বিভাগের ডিন হন।

কমলকুমারের ভাই বোনের পরিচয় দানের উদ্দেশ্য হল তাঁর পরিপার্শ্ব এবং ঘরানাটি যাতে বুঝতে অসুবিধা নাহয়। কমলকুমার নিজেও আঁকতেন কিন্তু এ বিষয়ে কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর ছিল না। তাঁর আঁকা সম্বন্ধে অনেক বিশেষজ্ঞই মন্তব্য করেছেন যে সেগুলির মূল্যমান কোনও অংশেই ন্যূন নয়। বিশিষ্ট শিল্প-সমালোচক আশোক মিত্র বলেছেন, -

“কমলবাবু যে সমস্ত ছবি এঁকেছেন তার আকৃতি যেমন তার থেকে নীরদবাবু যে বেশি কিছু করেছেন তা মনে হয় না। নীরদবাবুর ছবিগুলো ছবিই, কমলবাবুর ছবির মধ্যে আলাদা একটা টান আছে। অথচ নীরদবাবু চিত্রবিদ্যায় শিক্ষিত, কমলবাবু স্বশিক্ষিত চিত্রকর।”^৫

আমরা জানি কমলকুমার শ্রীরামকৃষ্ণের পরমভক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ যেমন গ্রামীণ লোক ছিলেন অথচ প্রচণ্ড জ্ঞানের অধিকারী হয়েও 'রসে বশে' থাকতে চাইতেন, কমলকুমারও জানতেন বাঙালির রস তার শেকড়ে, গ্রামীণ জীবনে। 'শব্দপত্র'-কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা, ১৯৮৪' তে 'কমলকুমার মজুমদার : কিছু পুরনো কথা' প্রবন্ধে রাধাপ্রসাদ গুপ্ত লিখেছেন যে কমলকুমার ফরাসি ভাষা জানতেন এবং ফরাসি স্টাইল অনুকরণ করতেন। অথচ সাহিত্য বা গানের জ্ঞান নিয়ে কফি হাউসে যখন অন্যরা আফালন করতেন তখন তিনি দেশীয় আর্ট বা লোকসংগীতের কথা বেশি করে বলতেন অথবা বিদেশি সাহিত্যের পাশে একই পঙ্ক্তিতে ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদকে বসাতেন। রাধাপ্রসাদ গুপ্তের প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি যে কমলকুমার যেমন বিশ্বের কলা সাহিত্যের খবর রাখতেন, তেমনি ভারতীয় ক্লাসিক্যাল এবং লোকশিল্পেও তাঁর অটল জ্ঞান ছিল।^৬

আই সি এস অশোক মিত্রের অধীনে ১৯৫১ সালে কমলকুমার যে জনগণনা বিভাগে কাজ করেন তাতে তাঁর অভিজ্ঞতার বুলিটি আরও ঋদ্ধ হয়। তাঁর কাজ ছিল বাংলার গ্রামে গঞ্জে ঘুরে স্থানীয় লোক-শিল্পের তন্ন-তন্ন করে অনুসন্ধান করে তার রিপোর্ট তৈরি করা। সেনসাসের কাজে জড়িত হওয়ার ফলেই কমলকুমারের হাতে সৃষ্ট হয়েছিল 'বাংলার

টেরাকোট্টা’, ‘বঙ্গীয় শিল্পধারা’, ‘বাংলার মৃৎশিল্প’, ‘শোলার কাজ’, ‘পটকথা’, ‘টোকরা কামার’-এর মত লোকশিল্প সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি।

এই জন্য ‘শব্দপত্রে’র উল্লিখিত সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ‘সে ভাষা ভুলিয়া গেছি’ প্রবন্ধে বলেছেন –

“কমলকুমারের গদ্যভাষার প্রধান বনিয়াদটি আমাদের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও মিশনারি যুগের গদ্য আদর্শের আভিপ্রায়িক উৎসমূল থেকে ক্রমাগত এক নিত্য গ্রামীণ লোকায়তিক বাগ্‌ভূমির দিকে চলে আসে।”^৭

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত অবশ্য সার্বিকভাবে কমলকুমারের ভাষার একটি মূল্যায়ন করেছেন তাঁর এই নিবন্ধে। আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য তাঁর ‘অন্তর্জলী যাত্রা’র রচনা কৌশল অনুসন্ধান। জীবনের নানা স্তর পেরিয়ে, নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কমলকুমার ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ রচনায় একটু বেশি বয়সেই হাত দিলেন। ‘অন্তর্জলী যাত্রা’র পরবর্তী স্তরে কমলকুমার পাঠকের কাছে আরও বেশি দুর্য্যোগ হয়ে উঠেছেন এবং ক্রমান্বয়ে তাঁর লেখা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে নবনীতা দেবসেনের মতো লেখিকাও তাঁর সমালোচনা করে লিখেছেন, –

“শ্রীকমলকুমার মজুমদার আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর তুল্য কবজির জোর নিয়ে খুব বেশি লেখক যে-কোনো যুগেই, যে-কোনো দেশেই জন্মান না। ‘অন্তর্জলী যাত্রা’র কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর সিংহাসন চির-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কমলকুমারের তুল্য ঐশ্বর্যের অপচয় এবং অপব্যবহার আর কোন দেশে কোন লেখক করেছেন, অথবা কোনো দেশেই কেউই করেছেন কিনা, তা আমি জানি না। এ-হেন শক্তি, এবং এ-হেন বিনাশ – দুটোই অসামান্য, এবং সেই কারণেই লক্ষণীয়।”^৮

অর্থাৎ ‘অন্তর্জলী যাত্রা’র ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নবনীতার আপত্তি তেমন নেই বোঝাই যায় কিন্তু এই উপন্যাস পাঠ করেই সেদিনের পাঠকরা বিস্মিত হয়েছিলেন। শুধুমাত্র সাধুভাষায় লিখেছেন বলেই যে সে বিস্ময় তা নয়, তাঁর শব্দপ্রয়োগ, বাক্যসজ্জা এবং নিখুঁতভাবে উপস্থাপনা-কল্পে যেভাবে বিভিন্ন শিল্পের মিশ্রণ ঘটেছে, তা এর আগে বাংলা কথা সাহিত্যে দেখা যায় নি। তাই প্রথম থেকেই অনেকের কাছে তিনি দুর্য্যোগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন।

তাঁর গদ্য, বিশেষভাবে উপন্যাসের গদ্য সাধুভাষায় লেখা, অচেনা কোনো শব্দের ব্যবহার নেই, অনেক সময়েই তৎসম শব্দ এবং নিত্য গ্রাম্যশব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত, প্রতিটি শব্দের অর্থ পাঠকের জানা, বড়জোর দু’একটির জন্য অভিধানের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে – তবুও তিনি দুর্লভ্য হয়ে ওঠেন শুধু চেনা শব্দের অচেনা ব্যবহারে। শব্দ যে কত শক্তিমান হতে পারে, কত ব্যঞ্জনাময় হতে পারে তা তাঁর রচনার অন্তরঙ্গ পাঠেই শুধু অনুভূত হয়। পরিস্থিতি, পরিবেশ বা মানসিক-জাগতিক অবস্থার প্রকাশ করতে গিয়ে চেনা শব্দ চেনা রঙের এমন ব্যবহার তিনি করেছেন যাতে পাঠককে পদে পদে ভাবতে হয়, প্রত্যেকটি শব্দই মনন-চিন্তন দাবি করতে পারে, সে শব্দ তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি – যাইহোক না কেন। এই শব্দের জোরেই তাঁর গদ্যভাষার সৃষ্টি হয়, যা থেকে পাঠক তিলমাত্র অমনোযোগী হতে পারেন না; তাঁর বক্তব্যের বাইরে যেতে পারেন না এবং বক্তব্যের ভেতরে ঢুকেও ব্যঞ্জনার হাজারো চোরাগলিতে হাতড়াতে থাকেন। যিনি অতঃপর সঠিক অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করেন, তিনিই সার্থক পাঠক, সংবেদনশীল পাঠক। তাই নিঃসন্দেহে একথা মেনে নেওয়া যায়, ‘কমলকুমারের পাঠক প্রকৃতপক্ষে অভিযাত্রী ও আবিষ্কারক।’^৯

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত কথিত ‘নিত্য গ্রামীণ লোকায়তিক বাগ্‌ভূমি’টি কীভাবে নির্মিত লাভ করল তার বিশ্লেষণ পাই উক্ত লেখকেরই অন্য একটি গ্রন্থে। সেখানে তিনি বলেছেন –

“কমলকুমারের রচনায়, অতএব, শব্দমনস্কতা শুধুই প্রাকরণিক কৌশল নয়, বরং কৌশলের অধিক এক আদিমতা, যা ভাষার জন্মকালীন, তথা আদিমতম প্রতীকদ্যোতনার সূত্রেই, সম্পর্কিত।”^{১০}

আবার একই অনুচ্ছেদে বলেছেন –

“অপরপক্ষে মহৎ লেখক শব্দের যথাযথ সংস্থানকল্পে, তার ধ্বনিসম্মত অনুসন্ধিৎসা ও প্রয়োগবিশেষত্বকে যে নিত্যনব মাত্রায় ভূষিত করতে চান, তা তো আসলে তাঁরই অভিজ্ঞভূমির বিস্তার ও বিবর্তনসাধ্য পরিণতির স্বার্থে।”^{১১}

শব্দ দিয়েই বাক্য হয় এবং বাক্য ভাষার বাহক। ভাষার মূলে শব্দ – প্রাকৃতিক ধ্বনির সাযুজ্য রক্ষায় হয়তো গড়ে উঠেছিল শব্দ এবং সংস্কারের দীর্ঘ পেষণে শব্দ অর্থের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক শব্দই প্রকৃতপক্ষে বস্তুর বা ভাবের প্রতীক, দ্যোতক বা চিহ্ন। কমলকুমারের রচনায় ‘শব্দমনস্কতা’, ‘কৌশলের অধিক এক আদিমতা, যা ভাষার জন্মকালীন, তথা আদিম প্রতীকদ্যোতনার সূত্রে সম্পর্কিত’ ... এবম্বিধ উক্তি প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে যখন উপন্যাসটির পাঠে দেখি কমলকুমার পরিচিত চিহ্নকে অর্থাৎ শব্দকে অপরিচিত বা নতুন ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করছেন। শৈলীবিজ্ঞানে চিহ্নায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই চিহ্নায়ন অধ্যয়নের নাম Semiotics। এটি এভাবে সংজ্ঞাত –

“Semiotics (from Greek ‘semiotikos’) (also called semiotic studies; ...) is the study of meaning-making, the study of sign processes and meaningful communication, designation, likeness, analogy, allegory, metonymy, metaphor, symbolism, signification and communication...”

Semiotics frequently seen as having important anthropological dimensions; for example, the Italian semiotician and novelist Umberto Eco proposed that every cultural phenomenon may be studied as communication.”^{১২}

এই meaningful communication সৃষ্টি করতে গিয়ে, প্রচলিত শব্দ-চিহ্ন মারফৎ নতুন meaning-making পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন কমলকুমার। এই শব্দ-চিহ্ন শুধুই বাইরের বস্তু নয়, এর সুপ্রয়োগে থিম আহরণ এবং উপস্থাপনা দুটোই তাঁর গদ্য রচনায় নতুন মাত্রা পেয়েছে। ‘প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে নির্মোক বলে প্রমাণ করেছেন তিনি। দীপায়ন-নির্ভর আধুনিকতার পরম্পরাকে রিক্ত ধ্বস্ত ও অন্তঃসারশূন্য বলে দেখিয়ে দিয়েছেন। অতি-উদ্ভাসিত জীবন-বলয়ের মোহজাল পেরিয়ে তিনি প্রান্তিকায়িত অনুপস্থিত বর্ণের নৈঃশব্দ থেকে আহরণ করেছেন তাঁর কথাবিজ্ঞ। কাহিনী উপস্থাপনার চিরাচরিত ধরনকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে আধুনিকতারও প্রত্যাখ্যান সূচিত হয়েছে। বহু ব্যবহারে জীর্ণ বাচনকে সরিয়ে দিয়ে তিনি তুলে ধরেছেন এমন ভাষা গ্রন্থনা যার প্রতিটি অনুপুঞ্জ কার্যত চিহ্নায়ক।”^{১৩}

‘অন্তর্জলী যাত্রা’র কথাবস্তু রামমোহন রায়ের সমকালীন। কৌলীন্য প্রথা আর সতীদাহের প্রেক্ষিতে অন্ত্যজ চাঁড়াল বৈজুর মানবিক-মাহাত্ম্য উন্মোচন এর মূল বিষয়। মানবিক-মাহাত্ম্য বলতে মানুষের ইহজাগতিক কাম-প্রেম-অস্থি-মাংস সকল কিছুর উদ্ভাসের কথাই বলা হচ্ছে। এরই সঙ্গে মিশে আছে গ্রিক অদৃষ্টবাদ। চাঁদ যখন লাল হবে, অন্তর্জলীতে শায়িত জীর্ণ বৃদ্ধ সীতারাম ‘দোসর’ নিয়ে যাবেন। সকলেই ধরে নিয়েছে সীতারামের ভাবীবধূ, নবোঢ়া নিতান্ত তরুণী যশোবতী সহমৃতা হবে। সীতারাম দোসর নিয়ে গেলেন, কিন্তু অন্যভাবে; কোটালের জলে ভেসে গেল দুজন। এই কোটাল আসার পূর্ব মুহূর্তে যশোবতী নিজেই তার চিরাচরিত সংস্কার, তার ব্রাহ্মণ্যের, সতীত্বের অভিমান ভুলে গিয়ে কোটালে গা ভাসিয়ে দিয়েছে – বৈজুর পৌরুষদীপ্ত শারীর আবেদনে সে ধরা দিয়েছে।

এ কথাবস্তুর উপস্থাপনায় শব্দ চয়ন এবং তার প্রয়োগ; ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ এবং সর্বোপরি না-কথার যে দরজা কমলকুমার খুলে দিয়েছেন তা আজও অনুপম। পূর্বেই উল্লেখিত যে কমলকুমারের দেশি বিদেশি চিত্র-ভাস্কর্য-সঙ্গীত সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান ছিল। আধুনা উপন্যাস বা গল্পে যে illustration সংযোজিত হয়, তাঁর গল্পে তার প্রয়োজন হয়নি, কারণ তিনি শব্দ দিয়ে যে ছবি এঁকেছেন, তা impression আর্টের অঙ্গ। ‘অন্তর্জলী যাত্রা’র প্রথম দৃশ্য গঙ্গাতীরের শ্মশান ঘাট। সময় শেষরাত্রি। প্রথম বাক্য ‘আলো ক্রমে আসিতেছে।’ তারপরেই প্রকৃতি এবং মানুষের উদ্দীপ্ত হওয়ার পালা। সেটাও তুলির কয়েকটি শাব্দিক আঁচড়ে ফুটে উঠল ক্রমবর্ধমান আলোর মতোই –

“এ নভোমণ্ডল মুজাফলের ছায়াবৎ হিম নীলাভ। আর অল্পকাল গত হইলে রক্তিমতা প্রভাব বিস্তার করিবে, পুনর্বীর আমরা, প্রাকৃতজনেরা পুষ্পের উষ্ণতা চিহ্নিত হইব। ক্রমে আলো আসিতেছে।”^{১৪}

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে রং আর শব্দ মিলে গিয়ে এক অদ্ভুত ছবির সৃষ্টি করেছে, যা শুধুই জগৎ নিরপেক্ষ ‘ছবি’ হয়ে থাকেনি, যা আমাদের অর্থাৎ প্রাকৃতজনের চিন্তা ভাবনাও জড়িয়ে নিয়েছে।

শব্দ, রং, সুর – সকল কিছুই অন্য কিছু নির্দেশ করে – সকল কিছুই প্রতীক। অনুভূতিপ্রবণ শিল্পী এই প্রতীক এমনভাবে ব্যবহার করেন যা শুধুই এক উপলব্ধির জগতে আমাদের নিয়ে যায়। কমলকুমার নিজেই ‘প্রতীক জিজ্ঞাসা’ প্রবন্ধে বলেছেন –

“সঙ্গীতে সুরটাই প্রতীক, বাণীর বাস্তবতার সহিত তাহার যোগ থাকে, উহা আমাদের বিশেষ এক মানসিকতাতে লইয়া যায়। ঠাকুর [শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব] বলিয়াছেন কথা ইশারা বটে। অর্থাৎ প্রতিটি শব্দ আমাদের জানা, এমনও যে ঐটির যথার্থ ধারণা নাই। যখন ঐটিকে সুরে লাগানো হয়, লাগা মাত্রই এক প্রচণ্ড পরিবর্তন শ্রোতার দেহে আলোড়িত হয়। অবাক এক মৌন চকিতে উদ্ভূত হইল।”^{১৫}

তাঁর উপন্যাসের গদ্যের বেলায় এই সূত্র প্রযুক্ত। শব্দের আভিধানিক অর্থের বাইরে নতুন এক ‘প্রচণ্ড পরিবর্তন’ ইশারা করে। স্বরলিপির অপেক্ষায় না থেকে বিভিন্ন রসের গান যেন আপনি বেজে ওঠে। বৃদ্ধ সীতারাম শায়িত। তাঁর পদদ্বয় গঙ্গার জলে। তাঁকে বেষ্টন করে একদল কীর্তনীয়া ঘুরছে। একজন সীতারামের পাশে দুলে দুলে গীতাপাঠ করছে আর মাঝে মাঝে সকলে ‘গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম বলো’ উচ্চারণ করছে। এই ঘটনা এভাবে বর্ণিত –

“বৃদ্ধের ওষ্ঠদ্বয় বিচ্ছিন্ন এবং এই অপরিসর ফাটলে বিন্দু বিন্দু গঙ্গোদক পড়িতেছে...। এই সঙ্গে বিলম্বিত লয়ে ‘গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম বলো’র দুঃসহ নিপীড়িত মর্ম্মান্তিক ভৌতিক ধ্বনিবিস্তার উথিত হইতেছে।

... কবিরাজের পিছনেই একজন সর্বাঙ্গ চাদরে আবৃত করিয়া, অথচ মুখটুকু খোলা, দুলিয়া দুলিয়া গীতাপাঠ করিতেছে। লোকটির সম্মুখে পুঁথি, কিন্তু পুঁথি দেখিবার আলো নাই, প্রয়োজনও নাই একারণে যে লোকটির গীত কণ্ঠস্থ...

... এবম্বিধ পাঠ, মরণোন্মুখ সীতারাম ব্যতীত আর আর যাঁহারা উপস্থিত তাঁহাদের মনে স্বতঃই নৈরাশ্যের সঞ্চর করিতেছিল। এই পরিবেশকে, গীতা ব্যাখ্যার গোঙানি ছাড়াও, এইক্ষণে অধিকতর ভয়ঙ্কর রহস্যময় করিয়াছিল নিকটবর্তী চিতা নির্বাপিত করার উদ্দেশ্যে জল নিক্ষেপের ফলে হস্ হস্ শব্দ...। কীর্তনীয়ারা, তাহারা হতাশার চোখ দিয়া একটি গীত গাহিতেছিল। উপস্থিত সকলে মন দিয়া অনেক গীত শুনিতেন।”^{১৬}

এখানে শব্দের মধ্যে উল্লেখিত সুরের বাইরেও একটি বিষণ্ণ ভয়প্রদ সুর মনের কানে শোনা যায়। তাই উপস্থিত সকলে এবং পাঠকও ‘মন দিয়া’ ‘অনেক গীত’ শুনতে পায়।

শব্দের অভিঘাতে শুধু চিত্র নয়, শুধু সুর নয়, পরিচিত শব্দের কৌশলময়, প্রায়-অপরিচিত প্রয়োগে চরিত্র নির্মিত হয় এক আশ্চর্য দৃঢ়তায়। বৈজু চণ্ডালের দাঁড়ানো এবং কথা বলার ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তোলার আড়ালে তার চরিত্র ফুটে ওঠে

–

“কেবলমাত্র বৈজু চাঁড়াল, রূপরসগন্ধের সততা মানিয়া নিভীক, দাঁড়াইয়া আছে, সে তাহার দুঃসাহসিক মোচে দৃষ্ট চাড়া দিয়া অদ্ভুত করুণাবাচক হাসি হাসিয়া অনেক কথাই বলিতেছিল, তাহার চোখে ঘুম নাই।”^{১৭}

বৈজু ‘রূপরসগন্ধের সততা’ মেনে শ্মশানের ধূসরতায় নিভীক। তার দার্শনিক কথা শুনে তাকে যখন প্রশ্ন করা হল এত কথা সে শিখল কোথা থেকে, তখন – ‘বৈজু আশ্রিত চাকচিক্য দুলিয়া উঠিল!’ সেই নীরস নিষ্পাণ পটভূমিতে বৈজু যেন একমাত্র প্রাণের ফোয়ারা। গল্পের আদ্যন্ত তার কথা, তার চলা, তার নানারূপ ক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ করি।

চিত্রশিল্পের প্রতি কমলকুমারের নিষ্ঠাই হয়তো তাঁর বর্ণনায় কোনও ফাঁক রাখতে দেয়নি। একটিও খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয় তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়নি। একটি চিত্র থেকে শব্দদেহের হাত মাটি ছুঁই ছুঁই করছে। বৈজুর সাবধানবাণী শুনে –

“হাতটিকে তুলিবার জন্য, একজন একটি বাঁশ দিয়া তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল, মৃত সাপের মত শ্লথ এ হস্ত –সৌহার্দ্য অভিমानी, এ হাতখানি ব্যগ্রতার স্থির নশ্বর রূপ! ইদানীং পুনর্ব্বার অগ্নিতে সে মনোরমত্ব ঠেলিয়া দেওয়া হয়, লাখ প্রবাদ প্রবচন এবং দিগদর্শন পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইবে।”^{১৮}

হাত ‘ব্যগ্রতার স্থির নশ্বর রূপ’, ‘মনোরম’ এবং হাতই লক্ষ বছরের অভিজ্ঞতা এবং কর্মরাজির প্রতীক রূপে এখানে উপস্থাপিত।

‘লোলচর্ম’, ‘কঙ্কালসার’ –অতিবৃদ্ধের বিশেষণে এসব শব্দবন্ধের ব্যবহার নিতান্তই ক্লিশে। কিন্তু কমলকুমার গঙ্গাতীরে অন্তর্জলীতে শায়িত, বিবাহের পাত্র ভাবী বর কুলীন সীতারামের বিষয়ে যখন লেখেন – ‘বৃদ্ধের দেহে কালের নিষ্ঠুর ক্ষতচিহ্ন, অসংখ্য ঘুণাক্ষর, হিজিবিজি।’^{১৯} তখন আমাদের মনের চোখে শুধু বৃদ্ধ নয়, সেই সঙ্গে এক ধূসর, সূক্ষ্ম বিষাদ ধরা পড়ে।

কুলীন ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীনারায়ণ স্বীয় তরুণী কন্যাকে সীতারামের হস্তে অর্পণ করতে চান। তিনি উদগ্রীব হয়ে জ্যোতিষী অনন্তহরির গণনার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। জ্যোতিষী বেলাতটে অনেক আঁচড় কেটে গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি নির্ণয় করে অবশেষে যখন লক্ষ্মীনারায়ণকে ডাকলেন, লক্ষ্মীনারায়ণ তখন উৎকণ্ঠায় প্রায় বাহ্যজ্ঞানহীন –

“লক্ষ্মীনারায়ণ এমত মনে হয় বৃক্ষরোপণ দেখেন নাই, হরিৎক্ষেত্র বলিতে কোন পাখী অথবা নদীর নাম বুঝায় তাহা যেন তাঁহার জানা নাই, মেলা খেলায় বাজিকরকে ডম্বর বাজাইতে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।”^{২০}

অনন্তহরি ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে সীতারামের আয়ু ফুরিয়ে যায়নি, তিনি আগামী পূর্ণিমায় পরলোকে গমন করবেন –

“চাঁদ যখন লাল তখন তার প্রাণ যাবে ... যাবে কিন্তু একা যাবে না হে। দোসর নেবে...”^{২১}

এই ‘দোসর’-এর ইঙ্গিতেই লক্ষ্মীনারায়ণের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল। কন্যাদায়ভারগ্রস্ত দরিদ্র কুলীন পিতার একই সঙ্গে দুশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণ পেয়ে নতুন ভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার ছবি এর চাইতে মনে হয় না বেশি ভালোভাবে স্পষ্ট করা যায়।

এর পরও অনন্তহরির গণনা চলছিল। এবার তিনি লক্ষ্মীনারায়ণকে ডাকার ফলে তাই লক্ষ্মীনারায়ণের এই ‘জড়বৎ সন্ধিৎসী’ অবস্থা। অতঃপর তিনি –

“...বেলাতটের আবছায়া ইয়েরোগ্লিফিক বিশ্লেষণের প্রতি ক্ষণেক দৃষ্টিপাত অন্তে জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, “সত্য অনন্ত ... দোসর...” বলিবার কালে তাঁহার অঙ্কুরিত কাঁচাপাকা দাড়িসমেত মুখখানি অত্যন্ত কিস্কৃত হইয়াছিল। যদিচ তাঁহার বদনমণ্ডল আর্য্যশোভা মণ্ডিত।”^{২২}

এই উদ্ধৃতিতে ‘বেলাতটের আবছায়ায় ইয়েরোগ্লিফিক বিশ্লেষণ’ শব্দচতুষ্টয় এক মুহূর্তে আমাদের প্রাচীন দৈবনির্ভরতা এবং আধিদৈবিক শ্রদ্ধার ধূসর জগতে নিয়ে যায়। প্রাচীন মিশরে খ্রিঃ পূঃ ৩২০০ থেকে ৪০০ খ্রিঃ পর্যন্ত যে লিপিতে বা ছবিতে পবিত্র দৈবশক্তি প্রচারিত হত, তা-ই ইয়েরোগ্লিফ (Heiroglyph)। নিওপ্লাটোনিজম-এর যুগে, বিশেষ করে রেনেসাঁসের যুগে ইয়েরোগ্লিফ হয়ে উঠেছিল আর্টের জগতে সাক্ষ্যভাবনা (esoteric idea) র প্রকাশ মাধ্যম।^{২৩}

বেলাতটে জ্যোতিষীর আঁকা দুর্বোধ্য রহস্যময় ছকগুলোর সঙ্গে ইয়েরোগ্লিফের তুলনা চিন্তন বোধ হয় কমলকুমারই করতে পারেন, কারণ, আবারও বলতে হয়, দেশি বিদেশি আর্টের অস্থিমজ্জার সঙ্গে ছিল তাঁর সুনিবিড় পরিচয়।

কমলকুমারের গদ্যের আলোচনায় আমরা এধরনের সহস্র উদাহরণ আহৃত করতে পারি। ফরাসি লেখক Buffon তাঁর ‘Discourse Sur la Style’ গ্রন্থে বলেছিলেন, ‘Style is the man himself’। প্রত্যেক লেখকেরই নিজস্ব শৈলী থাকে। এ শৈলী কিন্তু গড়ে ওঠে তিনটি জিনিসের ওপর ভিত্তি করে – এক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য; দুই, যুগমানস এবং তিন, লেখক ব্যক্তিত্ব। ওপরের আলোচনায় আমরা কমলকুমারের ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণের কথা উল্লেখ করেছি; এছাড়া যে যুগে ঔপনিবেশিক মনোভাবাপন্ন শিক্ষিত বাঙালি মাত্রই পাশ্চাত্যের নকল হতে চাইছে সেখানে কমলকুমার ফরাসি ভাষা জেনেও,

ফরাসি ফ্যাশন অনুকরণ করেও রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, ভারতচন্দ্র, স্থানীয় পটুয়া, সাধুভাষা ইত্যাদি আশ্রয় করে সরল প্রকাশ ভঙ্গিমার ছলনাকে নস্যাত করেছেন তাঁর নিজস্ব অভিব্যক্তি দিয়ে।

শুধু সাধুভাষা এবং তৎসম শব্দ নয়, তিনি তৎসম শব্দের পাশে অবলীলায় বসিয়ে দেন নিতান্ত ছাপোষা ঘরোয়া শব্দ, গুরু আর চণ্ডালে যে আবহমানকালের দ্বন্দ্ব, তা যেন ঘুচিয়ে দেন এক নিমেষে, প্রেমের মাধ্যমে, ঠিক যেমন ব্রাহ্মণ কন্যা যশোবতী আর চণ্ডাল বৈজুনাথের মিলন হয়। আমরা দেখি অন্তর্জলীতে শায়িত কুলীন ব্রাহ্মণ সীতারামের পাশে একজনকে গীতা পাঠ করতে, কিন্তু সে পাঠ যে আসলে কারোই কানে কিংবা মনে পৌঁছাচ্ছে না, সেটা স্পষ্ট হয় যখন কমলকুমার লেখেন, ‘গীতা ব্যখ্যার গোঙানি’। নস্যসেবী কবিরাজ বিহারীনাথ এই অসম বিবাহে আগাগোড়াই অসম্মত ছিলেন। সীতারামের পুনরুজ্জীবনে আশ্চর্য হয়ে এবং লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সঙ্গে যে বিবাহ হবেই, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে যেভাবে নস্য নিলেন তার বর্ণনা প্রায় তৎসম-রহিত, ‘বিহারীনাথ তাঁহাকে (লক্ষ্মীনারায়ণকে) কঠিন ভাবে পলকের নিমিষে দেখিয়া, আপনকার টাঁক হইতে নস্যের ডিবা বাহির করত কিঞ্চিৎ নস্য তালুতে ঢালিয়া, যুত করিয়া টিপ লইবার ছলে আপনাকে সুসংযতভাবে সামলাইয়া সশব্দে একটি টান দিলেন। ...’^{২৪} গম্ভীর ক্লাসিক রীতি অনুসৃতির পাশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্থান পায় ‘গোঙানি’ ‘টাঁক’ ‘ডিবা’ ‘যুত’ ‘টিপ’ ইত্যাদি অথচ এতে কোনও শাস্ত্রের প্রতি অনাচার হয় না, বরং একজন নাট্য-নির্দেশকের নির্দেশনার মতোই ত্রিয়ার মধ্য দিয়ে চরিত্র ফুটে ওঠে।

রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে বাংলা গদ্যের শৈলী আলোচনায় কমলকুমার এক মাইলস্টোন বিশেষ। তবে যে গদ্য রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়-বিদ্যাসাগরের সৃষ্ট এবং বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের যত্ন লালিত হয়ে আপামর বাঙালির প্রিয় প্রকাশ মাধ্যম হয়ে উঠেছে, কমলকুমারের গদ্য সেই জনপ্রিয়তার রঙিন হাতছানি থেকে অনেকদূরে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের গদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন-‘আধুনিক কালে গদ্যের অনেক বৈচিত্র্য দেখা গেছে, কিন্তু পদাঙ্ক ও যতিবন্ধনে এখনও আমরা বিদ্যাসাগরকে ছাড়িয়ে নতুন কোন পথ আবিষ্কার করতে পারিনি— যদি কেউ সেরকম দুঃসাধ্য চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেও থাকেন, তবু সে রীতি এখনও জনসমর্থন লাভ করতে পারেনি— জনবল্লভতা তো দূরের কথা। এই প্রসঙ্গে দুজন আধুনিক গদ্য লেখকের উল্লেখ করি— কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও কথাসাহিত্যিক কমল মজুমদার। সুধীন্দ্রনাথ কাব্যসমালোচনার দিকপাল, এবিষয়ে তিনি এলিয়টের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু তাঁর রচনাভঙ্গিমা ইচ্ছাকৃতভাবে দুরূহ ও আভিধানিক। কমল মজুমদার পুরাতন ধরনের (archaic) গদ্যরীতি অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এঁরা সন্ততি সৃষ্টি করতে পারলেন না, এ কথা সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হবে। বিদ্যাসাগরের সন্ততি দেশময় পরিব্যাপ্ত।’^{২৫}

ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের একথা সত্যি যে সুধীন্দ্রনাথ বা কমলকুমারের গদ্য জনবল্লভ নয় এবং অনুকরণকারীও নেই। এঁরা বাংলা গদ্যকে নিছক সহজ সরল করে শিক্ষার মাধ্যম করে তুলতে চাননি। আর কমলকুমার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির বা জনপ্রিয়তার ধারেকাছে যেতে চাননি, কোনও রকম আপোষের মধ্যে না গিয়ে রচনা করে গেছেন তাঁর সজ্জলক শিল্পসম্ভার উজাড় করে। একটি চিন্তাশীল পাঠক গোষ্ঠীই তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল, তার আকার যতই ছোট হোক না কেন তাকে বৃহদায়তন করবার কোনও প্রচেষ্টা কোনওদিন পরিলক্ষিত হয়নি।

Reference:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, হিরণ্য, ‘উপন্যাস : তার লক্ষণ, তার প্রেক্ষা’, *কমলকুমার মজুমদার : জীবন ও সাহিত্য*, লিইবার ফিয়ারা, কল, প্রথম সং, সেপ্টেম্বর ২০২২, পৃ. ১৫৯
১. অন্তঃপ্রচ্ছদ, *উপন্যাস সমগ্র কমলকুমার মজুমদার*, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সং, ২০০২
২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, গোলাপসুন্দরীর পটভূমিকা, *উপন্যাস সমগ্র কমলকুমার মজুমদার*, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সং, ২০০২, পৃ. ৮০
৩. www.sffronart.com
৪. ড. গঙ্গোপাধ্যায়, হিরণ্য, ‘জীবনী : আহেলী ডেকাডেন্স’, *কমলকুমার মজুমদার : জীবন ও সাহিত্য*, লিইবার ফিয়ারা, কল, প্রথম সং, সেপ্টেম্বর ২০২২, পৃ. ৭৪



৫. গুপ্ত, রাধাপ্রসাদ, 'কমলকুমার মজুমদার : কিছু পুরানো কথা', শব্দপত্র (কমলকুমার সংখ্যা), সম্পা. শুভ মুখোপাধ্যায়, বর্ষ ২, সংখ্যা ১, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ৫-৬
৬. রক্ষিত, বীরেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৭. দেবসেন, নবনীতা, 'পিঞ্জরে বসিয়া পাঠক : এবং অথবা সিদ্ধ তান্ত্রিকের শব্দসাধনা', নব-নীতা [নির্বাচিত রচনা সংকলন], মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কল-৭৩, বিংশ মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৮, পৃ. ৩৫০
৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'কমলকুমারের কথনবিশ্ব : অতিক্রমণের চিহ্নায়ন', উপন্যাসের প্রতিবেদন, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ১০২
৯. রক্ষিত, বীরেন্দ্রনাথ, 'কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার', 'এক অচিন নিস্তক্লতা', নবাব, শাস্ত্রীবাগান, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৭
১০. ঐ, পৃ. ১৭
১১. Wikipedia
১২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'কমলকুমারের কথনবিশ্ব : অতিক্রমণের চিহ্নায়ন', উপন্যাসের প্রতিবেদন, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ১০৯
১৩. কমলকুমার মজুমদার উপন্যাস সমগ্র। পৃ. ৫
১৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'কমলকুমারের কথনবিশ্ব : অতিক্রমণের চিহ্নায়ন', উপন্যাসের প্রতিবেদন, র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ১০৯
১৫. 'অন্তর্জলী যাত্রা', উপন্যাস সমগ্র কমলকুমার মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সং, ২০০২, পৃ. ৬
১৬. ঐ, পৃ. ৭
১৭. ঐ, পৃ. ৯
১৮. ঐ, পৃ. ৫
১৯. ঐ, পৃ. ১৬
২০. ঐ, পৃ. ১৪
২১. ঐ, পৃ. ১৬
২২. Wikipedia এবং DK Illustrated Oxford Dictionary, 2012
২৩. 'অন্তর্জলী যাত্রা', উপন্যাস সমগ্র কমলকুমার মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সং, ২০০২, পৃ. ২০
২৪. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩১২

Bibliography:

- উপন্যাস সমগ্র কমলকুমার মজুমদার। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সং, ২০০২
- দেবসেন, নবনীতা, নব-নীতা [নির্বাচিত রচনা সংকলন]। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। কল-৭৩, বিংশ মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৮
- বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কল-৭৩, ১৯৯৪
- ভট্টাচার্য, তপোধীর, উপন্যাসের প্রতিবেদন। র্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কল-০৯, জানুয়ারি, ১৯৯৯
- রক্ষিত, বীরেন্দ্রনাথ, কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার। নবাব, কল-৫৯, ডিসেম্বর, ১৯৮৫
- শব্দপত্র কমলকুমার সংখ্যা, সম্পা. শুভ মুখোপাধ্যায়, বর্ষ ২, সংখ্যা ১, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪
- সেনমজুমদার, জহর, উপন্যাসের ঘরবাড়ি। পুস্তক বিপণি, কল-০৯, মে, ২০০১
- DK Illustrated Oxford Dictionary, 2012